ব্যবহারিক বেদান্ত

অধ্যাপিকা ঊর্ম্মিলা সেন
অর্থনীতি বিভাগ

বেদ দুভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম কর্মকান্ড। দ্বিতীয় ভাগের নাম জ্ঞানকাণ্ড। জ্ঞানকাণ্ড বেদের অন্তে অবস্থিত বলে বেদের অন্তে অবস্থিত বলে এর আরেক নাম হলো বেদান্ত। বেদের সার -- এই অর্থেও বেদান্ত কথাটি ব্যবহৃত হয়। জীবনের মূল প্রশ্নের অনুসন্ধান অর্থাৎ "অহম্ কঃ" -- আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব -- এই গূঢ় প্রশ্নের উত্তর মেলে বেদান্তে। শুধু তাই নয়, অন্যভাবে দেখতে গেলে, বেদান্তই মানুষের দুঃখের মূল উৎসের সন্ধান দিয়েছে। বেদান্ত বা উপনিষদ বলেছে -- মানুষ যখন অজ্ঞ থাকে, তখন সে জানে না সে কে। কোথা থেকে এসেছে -- এই অজ্ঞতাই তার দুঃখের কারণ। এই অজ্ঞতার নামই হলো অজ্ঞান। মানুষ বোঝেনা যে দেহ আর আত্মা অবিনশ্বর। আত্মা নিত্য -- শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত বলেই আত্মার দুঃখও নেই, সুখ নেই -- আত্মা সুখেও স্থির, দুঃখেও অচল. কিন্তু দেহ তা নয় -- দেহের দুঃখও আছে , সুখ আছে। গীতার দুনম্বর অধ্যায়ের ২০ নম্বর শ্লোকে আছে - "ন জায়াতে ন ম্রিয়তে বা কদাচিন্ / ন আযম্ ভূত্বা ভাবিত বা ন ভূয়ঃ / আজো নিত্যঃ শাশ্বত অহম্ পুরাণো / ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। অর্থাৎ আত্মার জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। এই আত্মা কখনো উৎপন্ন হয় নি - না অতীতে, না বর্তমানে। ভবিষ্যতে কোনোদিন উৎপন্ন হবেও না। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, সুপ্রাচীন। শরীরীরের মতো আত্মা বিনষ্ট হয় না।

বেদান্ত কোনো ধর্ম নয় -- এটি একটি দর্শন। আরো ভালো ভাবে বলতে গেলে বেদান্ত সনাতন হিন্দু ধর্মের একটি দর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ এই বেদান্ত দর্শনকে লোকালয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বেদান্তকে ব্যবহারিক বেদান্তে রূপ দিয়েছিলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে আমরা পাই -- মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব , অতিথিদেবো ভব। স্বামী বিবেকানন্দ এই সুরে সুর মিলিয়ে আরেক ধাপ এগিয়ে বললেন -- "দারিদ্রদেবো ভব, মূর্খ দেবো ভব, আর্ত দেব ভব"।

বিবেকানন্দ লিখলেন --
"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সবিছে ঈশ্বর"
তাঁর মতে আধ্যত্মিক আর ব্যবহারিক জীবনে যে কাল্পনিক প্রভেদ আছে তা দূর করে দিতে হবে। তিনি বলেছেন -- সর্ব ভূতে ব্রহ্মজ্ঞান কর। ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজিত, সর্বব্যাপী। বেদান্তের

এই দর্শনকেই বিবেকানন্দ প্রচার করেছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন, বেদান্ত শুধু বনে অধিষ্ঠিত ঋষিদেরই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য নয় -- তিনি বেদান্তকে গৃহী মানুষের সংসারে পৌঁছে দিয়েছেন।

তিনি বললেন যে সেবার মধ্যে দিয়েই মানুষ তার অন্তরস্থ ব্রহ্মের বিকাশ ঘটাতে পারবে। এটাই মানব জীবনের মূল লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন "অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে"। আমরা যাদের পাপী ভাবি তাদের মধ্যেও ব্রহ্ম বিরাজমান -- তবে সুপ্তভাবে -- আমাদেরই উচিৎ পাপী কে ঘৃণা না করে তার অন্তরস্থ ব্রহ্মের বিকাশ ঘটানো। রবীন্দ্রনাথের সুরে সুর মিলিয়ে আমরা বলতে পারি -- "পাপীরে দিতে শাস্তি শুধু পাপেরে ডেকে এনেছি"

গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের ১৮ নম্বর শ্লোকে আমরা দেখি --
"বিদ্যা বিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মনে গাভী হস্তিনী
শুনি চ এব শ্বপাকে চ পন্ডিতাঃ সমদর্শিন"
অর্থাৎ পন্ডিত ব্যক্তি বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর এবং চণ্ডালের প্রতি সমদর্শী হন।

দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যবহারিক জীবনে আমরা কি বলি? আমরা বলি - "আরে আরে অপবিত্র দূর হয়ে যা রে"। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৯তম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন --
"সমঃ অহম সবভুতেষু ন মে দ্বেষ্যঃ অস্তি নপ্রিয়ঃ"
অর্থাৎ আমি সবার প্রতি সমান। কারুর প্রতি আমার দ্বেষ নেই। কেউ আমার প্রিয় নয়। তার মানে বিভাজন সৃষ্টি করি আমরা। বিবেকানন্দ এই বিভাজন দূর করে দিতে বলেছেন। তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী "শিবজ্ঞানে জীব সেবা" প্রচার করে গেছেন।

অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি করেছি আমরা। ইতর, নিচুজাত -- এই কথাগুলি আমাদের সৃষ্টি। বেদান্ত অস্পৃশ্যতার কথা বলে না। এটি আমাদেরই সৃষ্ট সমাজের ব্যাধি এর স্রষ্টা আমরা।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারবর্ষ থেকে অস্পৃশ্যতাকে দূর করতে চেয়েছিলেন। এই ভাবেই তিনি বেদান্তকে বন থেকে ব্যবহারিক জীবনে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সারা ভারত পরিক্রমা করে এই বাণীই প্রচার করেছিলেন -- "ব্রহ্ম হতে কীটপরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়"। তিনি প্রকৃত বৈদান্তিক সন্যাসী ছিলেন। তিনি বেদান্ত দর্শনকে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকিয়েছিলেন। তিনি পারমার্থিক সত্যের সাথে ঐহিক জীবনের মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

ব্যবহারিক বেদান্তের কয়েকটি শিক্ষা তিনি তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে শিখেছিলেন। প্রথম শিক্ষা হলো -- অকারণ, অহেতুক নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। মানুষকে ভালোবাসতে হবে -- এবং দরিদ্র, ইতর নির্বিশেষে। ব্যবহারিক বেদান্ত প্রসারে স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা নিয়েছিলেন শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর থেকেও। শ্রী শ্রী মা বলেছেন -- জগৎকে আপনার করে নিতে হবে। আমাদের সেই ব্রহ্মকে ভালোবাসতে হবে। সবাইকে ভালোবাসা মানে তাদের অন্তরস্থ ব্রহ্মকে ভালোবাসা। সাথে সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ একথাও বলেছেন -- সকলের মধ্যে নারায়ণ দেখবে। কিন্তু ঠগনারায়ণ থেকে দূরে থাকবে। দ্বিতীয়ত মানব জীবনে মূল উদ্দেশ্য হলো ঈশ্বর লাভ। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন -- "যত মত তত পথ", সব পথ দিয়েই তাকে পাওয়া যাবে -- সব ধর্মই সত্য, ছাতে ওঠা নিয়ে কথা তা তুমি পাকা সিঁড়ী দিয়েও উঠতে পার, কাঠের সিঁড়ী দিয়েও উঠতে পার। আবার বাঁশের সিঁড়ী দিয়েও উঠতে পার।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম অবলম্বন করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন যে সব ধর্মের মর্মকথা এক।

তৃতীয়ত একাধিক ভাবে জ্ঞানী ও ভক্ত দুই-ই হওয়া চাই। নিজের মুক্তি ও জগতের মঙ্গল -- দুই-ই চাই। এটি সম্ভব জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ ও কর্মযোগের সমন্বয়ের মাধ্যমে জগৎকে ত্যাগ করে নয়। এর সহজ উপায় হলো যদি আমরা সবেতেই ঈশ্বরের সৃষ্টিকে উপলব্ধি করি। অর্থাৎ সব কাজই যদি মনে করি -- তাঁর কাজ -- তবেই এটি সম্ভব -- এটি সম্ভব হবে যদি আমরা নিষ্কাম কর্ম করি তবেই। এই ভাবে কর্ম করে আমরা সংসারে থেকেও ঈশ্বর লাভের পথে অগ্রসর হতে পারব -- আমাদের ক্রমশঃ উত্তরণ ঘটবে। সংসার ত্যাগ করে বনে গিয়ে উপাসনা করার দরকার নেই। এটাই ব্যবহারিক বেদান্তের মূল বাণী। বরং সংসারে থেকে সঠিক ধর্ম পালন করলে আমরাও জনক রাজার মত ঋষি হয়ে উঠতে পারব। বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায় কাজ করে যেতে হবে ।

এই প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন -- "বিশ্রাম আমার জন্য নয়। আমি খাটতে খাটতে শরীর ত্যাগ করতে চাই। আমি ভালোবাসি কাজ।" এর থেকেই আসছে শ্রীরামকৃষ্ণের চতুর্থ বেদান্ত শিক্ষা -- নিষ্কাম কর্মযোগ বা সেবাযোগ। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁকে শিখিয়েছিলেন -- সর্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি -- জীব শিব অভেদাত্মা। স্বামী বিবেকানন্দ বলে উঠলেন -- "work is worship"।

কঠিন, শুষ্ক, নীরস বেদান্ত কে নিরক্ষর শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষায় আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা যদি শিবজ্ঞানে জীব সেবা করতে পারি, তাহলে automatically আমাদের ভিতরে রাগ, দ্বেষ, হিংসা চিরতরে দূরে চলেযাবে । আমাদের মধ্যে

শ্রেষ্ঠ ধর্ম মানবিকতার উন্মেষ হবে। এর জন্য আলাদা করে কিছু করতে হবে না। শিবজ্ঞানে জীব সেবা করতে করতেই চিত্ত শুদ্ধ হয়ে যাবে। আমারাই আস্তে আস্তে বুঝতে পারবো যে আমরা ব্রহ্মের অংশ।

আমরা যদি এই ভাবে বিচার করি, তাহলে আমরা পরধর্মসহিষ্ণুও হয়ে উঠতে পারবো। তাহলে অবসান ঘটবে ধর্মের ভিত্তিতে হানাহানির। এখানেই হিন্দু ধর্মের সনাতনত্ব, সর্বজনীনত্ব। হিন্দু ধর্ম সব ধর্মের মধ্যে মিল খুঁজে বের করতে পারে।